ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব
Management Theories

ইউনিট ২

ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Management Theory) ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে এবং ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাও একটি অত্যাবশ্যকীয় কৌশল ও জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিংশ শতাব্দীর এ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক শিল্প জগতে ব্যবস্থাপনা তার স্বীয় প্রোজ্বলতায় দেদীপ্যমান। ব্যবস্থাপনার এরূপ উন্নয়নে অনেক খ্যাতিমান গবেষক ও চিন্তাবিদ বহু মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এ সকল মনীষীদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পপতি, পেশাদার ব্যবস্থাপক, বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, স্বনামধন্য অধ্যাপক, শিল্প মনোবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ রয়েছেন। এ সকল মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যবস্থাপনা কি, একে কিভাবে আয়ত্ব করতে হবে ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়েই এ সকল মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করেন। পরবর্তীকালে এ সমস্ত ধ্যান ধারনাই ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায়ই ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ঘটে। তাই মানুষ যখন সংবদ্ধ হয়েছে, কাজের জন্য অন্যের সহায়তা গ্রহণ করতে শুরু করেছে, পেশা অবলম্বন করেছে, তখন থেকেই ব্যবস্থাপনার ক্রমবিবর্তন শুরু হয়েছে। এরপর সমাজের বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ ইউনিট থেকে আপনি ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও জানতে পারবেন। তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করে আমরা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা, মধ্যযুগের ব্যবস্থাপনা ও শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা

পাঠ-২.২ : আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা

পাঠ-২.৩ : ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুল বা দর্শন

পাঠ-২.১ প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা, মধ্যযুগের ব্যবস্থাপনা ও শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা

Management in Ancient Period, Middle Stage and Industrial Revolution Period

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মধ্যযুগের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা (১৭৫০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা (খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত)

Management in Ancient Period

প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ ব্যক্তি তথা নেতৃত্ব দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সভ্যতার সূচনাতেই বিভিন্ন দেশের মানুষ ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে অবদান রেখেছে। এর মধ্যে মেসোপটেমিয়া, মিসর, চীন, রোম, গ্রীস, বেবিলন, ভারত প্রভৃতি দেশে ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মেসোপটেমিয়ায় ব্যক্তি নেতৃত্ব থেকে ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটে। ইউফ্রেটিস উপত্যকায় বসতি স্থাপনকারী যাযাবরগণ কৃষিকাজ, মৃৎশিল্প ও বস্ত্র শিল্পের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরীকরণ, নথি সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদির প্রচলন করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ে নির্মিত মিসরের পিরামিড উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর বহন করছে। প্রাচীন মিসরীয় রাজাগণ বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রম বিভাগ, রেকর্ড সংরক্ষণ, উপদেষ্টা ব্যবহার ইত্যাদির প্রচলন করে। এ সময়ে হজরত মুসা (আ) তাঁর অনুসারীদের ভেতর থেকে সামর্থ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দলপতি নির্বাচন করতেন। দলপতি নির্বাচনের এ রীতি আজও সমানভাবে সমাদৃত।

পাচীন চীনে লাও-জু (Lau-Tzu) নামক এক ধর্মীয় নেতা কর্মী নিয়োগ ও মূল্যায়ন, পদোন্নতি, শাস্তি বিধান ইত্যাদির প্রচলন করেন। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চীনের রাষ্ট্রীয় কাজে উপদেষ্টা ব্যবহার, শ্রম বিভাগ, পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

রোমের ক্যাথলিক গির্জা প্রথম আনুষ্ঠানিক সংগঠনের স্বীকৃতি পায় এবং গীর্জার পোপের নেতৃত্বে কার্য বিশেষায়ন, কার্যভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। এছাড়া প্রাচীন রোমের বিকশিত বস্ত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিচানার জন্য জোট ও কোম্পানী জাতীয় সংগঠন বেড়ে ওঠে।

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে প্রকাশ করেন যে, ব্যবস্থাপনা একটি সার্বজনীন বিষয় এবং এটি একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক কাজ।

খ্রীস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবী (Humurabi) রাজ্য পরিচালার জন্য বিশেষ বিধান চালু করেন যা "The code of Hummurabi" নামে খ্যাত ছিল। এই সভ্যতা থেকে আমাদের কাছে যে আইনগুলো এসেছে সেগুলো হলো- ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিক্রয়, ঋণ চুক্তি, অংশীদারীত্ব সম্মতি, চুক্তিবদ্ধ নোট ইত্যাদি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতের সিন্ধু অববাহিকায় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ব্যবস্থাপনারও উন্নতি ঘটে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, বগুড়ার মহাস্থানগড়, রাজশাহীর পাহাড়পুরে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরিচয় বহন করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা রয়েছে। মন্ত্রীর গুণাবলী, নেতা, নির্বাচন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা কৌটিল্যের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের (খ্রিস্টের জন্মের পর হতে শিল্প বিপ্লবের পূর্বকাল) ব্যবস্থাপনা

Management in Middle Age

এ যুগের প্রতিষ্ঠানসমূহ সামন্তবাদী কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এ যুগের মানুষ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। মধ্যযুগে যারা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদের সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

আল ফারাবি ঃ ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল ফারাবী লিখিতভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নেতার গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি একজন নেতার প্রচুর বুদ্ধিমত্তা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা, সত্য, নিষ্ঠাবান, মিতব্যায়ী, অধ্যবসায়ী, সম্পদে অনাসক্তি প্রভৃতি গুণ থাকা দরকার বলে মনে করেন।

ইমাম গাজ্জালী ঃ ১১০০ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী "নসিহাত আল মুলক" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শাসকশ্রেণীর জন্য ন্যায় বিচার, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও সংযম এই চারটি গুণ অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে তিনি হিংসা, ঔদ্ধতা, সংকীর্ণতা ও শত্রুতা এই চারটি দোষ পরিত্যাজ্য বলে বর্ণনা করেন।

চতুর্থদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কারবার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়।

লুকা প্যাসিওলি ১৪৯৪ সালে ইতালিতে দু-তরফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Double Entry System) প্রবর্তন করেন। এটা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি সাধিত হয়। এ সময়ে ইতালিতে অংশীদারী ও যৌথ উদ্যোগ কারবারের প্রসার ঘটে।

থমাস মুর ঃ ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি "ইউটোপিয়া" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশেষায়ন এবং মানব শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিন। তিনি মনে করতেন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা (১৭৫০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ)

Management in the Industrial Revolution Period

সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর সময়ে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ সময়ে উৎপাদনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের স্থলে অভিনব যন্ত্রপাতির আবির্ভাব ঘটে। পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে বড় বড় শিল্প কারখানায় উৎপাদন বেশী পরিমাণে শুরু হয়। এই বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। এ যুগে যারা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

জেম্‌স স্টুয়ার্ট (James Stuwart) ঃ ১৭৫৭ সালে স্যার জেম্‌স স্টুয়ার্ট তাঁর প্রকাশিত একটি গ্রন্থে ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে

তত্ত্ব প্রদান করেন এবং শিল্পোৎপাদনে যন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন।

এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ঃ এ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। তিনি ১৭৭৬ সালে তাঁর লিখিত 'The wealth of Nations' গ্রন্থে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এখানে তিনি শ্রমবিভাগের পক্ষে নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক সুবিধার কথা উল্লেখ করেন।

১. শ্রম বিভাজন শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ায়।

২. এটা শ্রমিকদের সময় বাঁচায়।

৩. নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে এটা শ্রমিকদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সাধন করে।

সুতরাং ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে এ মনীষীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বোল্টন ও জেম্‌স ওয়াট (Boulton & James Watt) ঃ এই দুই বিজ্ঞানী তাদের উদ্ভাবনী কার্যের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যেসব ক্ষেত্রে অবদান রাখেন তন্মধ্যে বাজার গবেষণা ও পূর্বানুমান, কার্য প্রবাহ ও প্রয়োজনের নিরিখে পরিকল্পিত যন্ত্রপাতি বিন্যাস, উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার আদর্শমান নির্ণয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) ঃ তিনি ১৮০০ হতে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন বস্ত্রশিল্পে ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এক গবেষণা চালান যা তখনকার দিনে অভূতপূর্ব বলে খ্যাত ছিল। তিনি কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে খ্যাত যা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত।

শিল্প বিপ্লবের সে যুগে শ্রমিকদেরকে যখন যন্ত্রের মত মনে করা হত সে সময়ে ওয়েন তাঁর কারখানায় কার্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করেন। কারখানায় কর্মরত বালক-বালিকাদের জন্য সর্বনিম্ন কার্য বয়ঃসীমা বৃদ্ধি করেন, কর্মচারীদের জন্য কার্য ঘন্টা হ্রাস করেন, কারখানায় শ্রমিকদের আহার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন, কর্মচারীদের জন্য উৎপাদন খরচায় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্যে স্টোরের ব্যবস্থা করেন এবং কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান ও রাস্তঘাট নির্মাণ করে কারখানা জীবনকে আকর্ষণীয় করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর এ গৌরবোজ্জল ভূমিকার জন্য তাকে "আধুনিক শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক" নামেও অভিহিত করা হয়।

চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ঃ ব্রিটিশ গণিতশাস্ত্র বিদ অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তিনি অ্যাডাম স্মীথ কর্তৃক উল্লেখিত শ্রম বিভাজনের সুবিধাসমূহের সাথে পারিশ্রমিক নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ দক্ষতা নীতিও যোগ করেন।

তিনি শ্রমিকদের জন্য মুনাফা বন্টন প্রথার সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য যে, উৎপাদন প্রকৌশল, প্রণোদনামূলক মজুরী ইত্যাদির উপর ব্যাবেজের অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা (খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত) , মধ্যযুগের ব্যবস্থাপনা ও শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনাচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপঃ

ইউনিট ২, এ ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার নীতিমালার প্রবর্তক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরী ফেয়ল। ব্যবস্থাপনার মোট নীতিমালা ১৪টি। হেনরী ফেয়ল ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে তাঁর লেখা পুস্তকে সর্বপ্রথম নীতিমালাগুলো উল্লেখ করেন কিন্তু এগুলো তাঁর জীবদ্দশায় অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর এগুলো ব্যবস্থাপনার নীতিমালা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

পাঠ-২.২ আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা
Management in the Modern Age

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা (১৮৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পযন্ত) সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা (১৮৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পযন্ত)

Manament in the Modern Age

মূলত শিল্প বিপ্লবের যুগ শেষেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়। এ সময়ে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সুশৃংখল ও ধারাবাহিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। আধুনিক যুগেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মনীষী তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারা ও তত্ত্ব দিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। নিম্নে প্রধান প্রধান মনীষী সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর (Frederic Winslow Taylor, ১৮৫৫-১৯১২) ঃ

১৮৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিম্মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া এ প্রতিভাধর ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে (১৮৭০-১৯১২) সাধারণ শ্রমিক থেকে বড় কারখানার শীর্ষপদ লাভ করেছিলেন। কর্মাবস্থায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক কেউই একটি নির্দিষ্ট কর্ম দিবসে বাঞ্ছিত কার্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত নয়। উৎপাদনের কোন সুশৃংখল পদ্ধতি ছিল না। কাজ সম্পাদনের উত্তম পদ্ধতির জন্য তিনি প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নিরীক্ষণ, গতি নিরীক্ষা ও ক্লান্তি নিরীক্ষণ এর উপর জোর দেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Principles of Scientific Management'- এ নিম্নোক্ত চারটি নীতির কথা উল্লেখ করেনঃ

১. প্রত্যেক কার্য সম্পাদনে সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন;

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিক কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন;

৩. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি; ও

৪. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষম বন্টন, যাতে তারা নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে।

এছাড়াও তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নকে নির্বাহী কার্য হতে আলাদা ভাবে দেখান। কার্য সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিকদের জন্য পার্থক্যমূলক মজুরী প্রথারও প্রবর্তন করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে মানসিক বিপ্লবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

হেনরী ফেয়ল (Henri Fayol, ১৮৪১-১৯২৫) ঃ

হেনরী ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। তিনি মূলতঃ শিল্পপতি ছিলেন এবং ১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটি বৃহৎ কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুলের প্রবক্তা হিসেবেও খ্যাত। কেউ কেউ তাকে সার্বজনীনবিদ (Universalist) বলে থাকেন।

১৯১৬ সালে ফরাসী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত "General and Industrial Administration"- শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ব্যবস্থাপকের ছয়টি কাজের কথা উল্লেখ করেন। যথাঃ

পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ। বস্তুতঃ এটাই ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর সর্বপ্রথম

সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ফেয়ল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে নিম্নোক্ত ছয়টি স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করেন।

১. কারিগরী কার্যাবলী (উৎপাদন সংক্রান্ত);
২. বাণিজ্যিক কার্যাবলী (ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত);
৩. আর্থিক কার্যাবলী (মূলধন সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার);
৪. নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম (সম্পদ ও ব্যক্তির নিরাপত্তা);
৫. হিসাবরক্ষণ (জমা-খরচ, পরিসংখ্যান) ও
৬. ব্যবস্থাপনা কার্য (পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ)

ফেয়ল মনে করতেন যে, ব্যবস্থাপককে ১৪টি নীতি অনুসরণ করতে হয় যা সর্বত্রই প্রয়োগযোগ্য। ফেয়লের এ নীতিগুলো আজও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ নীতিগুলো সম্পর্কে আমরা এই ইউনিটের চতুর্থ পাঠে বিস্তারিত ভাবে জানব।

হেনরী এল, গ্যান্ট (১৮৬১-১৯১৯) [Henry L. Gantt]

হেনরী এল. গ্যান্ট ছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। টেলরের সহকর্মী হিসেবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ব্যবস্থাপনার যাবতীয় উপাদনের মধ্যে মানসিক উপাদানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্যান্ট তাঁর আবিস্কৃত গ্যান্ট চার্ট এর জন্য বেশী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এটা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমান কালের (PERT) ও (CPM) কৌশলদ্বয়ের পূর্বসূরী হচ্চে এই গ্যান্ট চার্ট।

এছাড়াও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে তার অন্যান্য অবদান হচ্ছে কাজ ও বোনাস ব্যবস্থার প্রচলন, শ্রমিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্ক নিলব্রেথ ও লিলিয়ান গিলব্রেথ ঃ (১৮৮৬-১৯২৪, ১৮৭৮-১৯৭২) (Frank and Lillian Gilbreth)

ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ ও তাঁর স্ত্রী লিলিয়ান গিলব্রেথ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সময় নিরীক্ষণ ও গতি নিরীক্ষণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ১৯১৫ সালে শিল্প মনোবিজ্ঞানে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত লিলিয়ান বিলব্রেথ ছিলেন ব্যবস্থাপনা জগতে সর্বপ্রথম স্বার্থক মহিলা। ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথের চিন্তা চেতনা ছিল কার্য সম্পাদনের সর্বোত্তম পদ্ধতি আর লিলিয়ান বিলব্রেথের সাধনা ছিল মানবিক উপাদান সংক্রান্ত।

হুগো মুনস্টারবাগ (Hugo Munsterberg, ১৮৬৩-১৯১৬)

তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানের জনক হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রধান অবদান হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ।

এলটন মেয়ো (Elton Mayo, ১৮৮০-১৯৪৯)

তিনি মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তার অবদান হচ্ছে গোষ্ঠী সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ ও কর্মী দক্ষতার ওপর কারখানার পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা।

মেরি পার্কার ফল্টে (Mary Parker Follet)

এ মহীয়সি মহিলা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর (Dynamic Administration) গ্রন্থে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, সংঘাত, সংহতি, ও সমন্বয়সাধন ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চেস্টার আই. বার্নাড (Chester I. Barnard) [১৮৮৬-১৯৬১]

তিনি ব্যবস্থাপনার আধুনিক সিসটেম মতবাদের প্রবক্তা। তার অবদান হচ্ছে সংগঠন তত্ত্ব, ব্যবস্থাপনার সমাজতান্ত্রিক দিক, যোগাযোগের সমাজতাত্ত্বিক, যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

ম্যাক্স উইবার (Max Weber) ঃ জার্মান এই মনীষী আমলাতন্ত্রের জনক।

ভিলফ্রেডো পেরেটো (Vil Fredo Pareto) ঃ মনীষীকে সামাজিক সিস্টেম পদ্ধতির জনক বলা হয়।

ভগলাস ম্যাক গ্রেগর (Doglus Mc Gragor) ঃ ম্যাকগ্রোরের x ও y তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান। তাঁর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জজ আর টেরি (Jorge R. Terry)

এই বিখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন মতবাদ বা স্কুল সম্পর্কে ধারণা দিন। উপরিউক্ত মনীষীগণ ছাড়াও আরো অনেক মনীষী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে তাঁদের নিজ নিজ অবদান রাখেন।

সবশেষে বলা যায়, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের ধারার সাথে সংগতি রেখে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর ফলেই আজ সারা পৃথিবীতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা (১৮৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পযন্ত) সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

মূলত শিল্প বিপ্লবের যুগ শেষেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়। এ সময়ে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সুশৃংখল ও ধারাবাহিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। আধুনিক যুগেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মনীষী তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারা ও তত্ত্ব দিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ১৮৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিম্মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া এ প্রতিভাধর ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে (১৮৭০-১৯১২) সাধারণ শ্রমিক থেকে বড় কারখানার শীর্ষপদ লাভ করেছিলেন। কর্মাবস্থায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক কেউই একটি নির্দিষ্ট কর্ম দিবসে বাঞ্ছিত কার্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত নয়। উৎপাদনের কোন সুশৃংখল পদ্ধতি ছিল না। কাজ সম্পাদনের উত্তম পদ্ধতির জন্য তিনি প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নিরীক্ষণ, গতি নিরীক্ষা ও ক্লান্তি নিরীক্ষণ এর উপর জোর দেন। হেনরী ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। তিনি মূলতঃ শিল্পপতি ছিলেন এবং ১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটি বৃহৎ কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের মহা পরিচালক ছিলেন। তিনি কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুলের প্রবক্তা হিসেবেও খ্যাত। কেউ কেউ তাকে সার্বজনীনবিদ (Universalist) বলে থাকেন।১৯১৬ সালে ফরাসী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত Administration Industrielle et Generale hv পরবর্তিতে ইংরেজিতে অনুদিত হয়। "General and Industrial Administration"- শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ব্যবস্থাপকের ছয়টি কাজের কথা উল্লেখ করেন।

পাঠ-২.৩ ব্যবস্থাপনা মতবাদের অন্যান্য স্কুল বা দর্শন
Other Thoughts or Schools of Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা মতবাদের অন্যান্য স্কুল বা দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুল বা দর্শন
Thoughts or Schools of Management

ব্যবস্থাপনা একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাও একটি অত্যাবশ্যকীয় কৌশল ও জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিংশ শতাব্দীর এ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক শিল্প জগতে ব্যবস্থাপনা তার স্বীয় প্রোজ্বলতায় দেদীপ্যমান। ব্যবস্থাপনার এহেন উন্নয়নে অনেক খ্যাতিমান গবেষক ও চিন্তাবিদ বহু মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এ সকল মনীষীদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পপতি, পেশাদার ব্যবস্থাপক, বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, স্বনামধন্য অধ্যাপক, শিল্প মনোবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ রয়েছেন। এ সকল মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যবস্থাপনা কি, একে কিভাবে আয়ত্ব করতে হবে ইত্যাদি বিষয়া নিয়েই এ সকল মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করেন। পরবর্তীকালে এ সমস্ত ধ্যান ধারনাই ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যবস্থাপনা মতবাদের এ স্কুলগুলি ব্যবস্থাপনা দর্শনের এত অধিক সংখ্যক স্রোতধারার উদ্ভব ঘটিয়েছে যে সাম্প্রতিক কালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদেরকে এবং পেশাদার ব্যবস্থাপকগণ তাদের অধিনস্থ কর্মীদেরকেক কোন পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে দ্বন্দ্বে পড়েছেন। এ পরিস্থিতিকে জনৈক মনীষী 'ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জংগল' বলে অভিহিত করেছেন। অতএব ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুলগুলি হল প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের ব্যবস্থাপনার স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিভিন্নমূখী দর্শন ও মতবাদ যা বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিম্নে ব্যবস্থাপনা মতবাদের প্রধান স্কুলসমূহের উল্লেখ করা হলোঃ

অভিজ্ঞতা প্রসূত স্কুল বা কেইস স্কুল, কার্যভিত্তিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্কুল, মানবীয় আচরণ ভিত্তিক স্কুল, যোগাযোগ কেন্দ্রিয় স্কুল, সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্কুল, সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রথা স্কুল, গাণিতিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান স্কুল, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্কুল, পরিস্থিতি প্রেক্ষিত স্কুল, ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা স্কুল, ম্যাককিনসের "সপ্ত-এস" স্কুল। নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলোঃ

(১) অভিজ্ঞতা প্রসূত স্কুল বা কেইস স্কুল (Case School)

এ স্কুলের প্রবক্তাগণের মতে ব্যবস্থাপনাকে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যায়ণ করতে হবে অর্থাৎ অতীতের অনুরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপক কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, কোন বিশেষ সিদ্ধান্তটি ফলপ্রসূ এবং কোনটি দুর্বল ছিল ইত্যাদি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে ব্যবস্থাপক বর্তমান পরিস্থিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারবেন। এ স্কুলের প্রবক্তাগণের মধ্যে আরনেষ্ট ডেল অন্যতম এবং হাভার্ড বিজনেস স্কুলও এর সমর্থক। নিম্নোক্ত অনুমিত ধারনাবলীর উপর ভিত্তি করে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেঃ

ক) ব্যবস্থাপনা অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল।

খ) অতীতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ভাল-মন্দ উভয় দিক বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক বর্তমানের অনুরূপ পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

গ) একমাত্র তুলনামূলক পরিস্থিতির অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পেশাদার শিক্ষানবীশ ও ছাত্রদেরকে ব্যবস্থাপনার কলা-কৌশল জ্ঞাত করানো সম্ভব।

ঘ) বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, অতীত ইতিহাস বা পরিস্থিতি বিশ্লেষন করে কতিপয় সাধারন নিয়ম প্রবর্তন করা যায়, যা ভবিষ্যৎ কর্ম প্রক্রিয়ার পথ-নির্দেশিকা হিসেবে অনুসরণ কিংবা প্রয়োগ করা যায়।

সমালোচনা

ক) আইন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদির মত ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান নহে। তদুপরি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কদাচিৎ অতীত পরিস্থিতির অনুরূপ হয়। তাই সাদৃশ্যমূলক পরিস্থিতি ব্যতীত অভিজ্ঞতা খুব কম ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়।

(খ) কতিপয় পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করে থাকেন। ফলে অতীত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

(গ) আধুনিক শিল্প জগৎ অত্যন্ত জটিল। নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন অভিনব পদ্ধতি, কৌশল ফর্মূলা ইত্যাদি ব্যবসায় জগৎকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের উত্তম সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়া বর্তমানের জন্য সেকেলে হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতা ব্যবসায়ের জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(ঘ) অতীত অভিজ্ঞতার উপর অত্যাধিক নির্ভরশীল ব্যবস্থাপকের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভা লোপ পায়।

বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনাক্ষেত্রে এ মতাবাদের গুরুত্ব কম নহে। পূর্ব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ব্যবস্থাপনার মূলনীতি প্রয়োগের তদন্তকরণে সহায়তা করে। অতীত ঘটনাবলীর উপর গবেষণা চালিয়ে মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর কর্মপ্রচেষ্টা উপেক্ষা করা যায়। সর্বোপরি জ্ঞান বিতরণে এ মতবাদ অনেকটা বাস্তবমুখী।

(২) কার্যভিত্তিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্কুল (Functional or Management System School)

এ স্কুল অনেক সময় æClassical School'' 'Traditional School'' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। মহামতি হেনরী ফেয়ল এ স্কুলের জনক। তবে এইচ. কুঞ্জ ও সি, অডোন্যাল প্রমুখ অধ্যাপকগণ এই স্কুলের উন্নয়নে প্রচুর অবদান রাখেন। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনাকে তার কার্যাবলীর ভিত্তিতে অধ্যয়ন করতে হবে। অন্যান্য মতবাদের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় উপাদানসমূহও এ মতবাদের আওভূক্ত। মোট কথায় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাবলীই ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়বস্তু। নিমোক্ত অনুমিত ধারণাবলীর উপর ভিত্তি করেই এইমতবাদ সৃষ্টি হয়েছেঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা সম্নন্ধীয় কতিপয় উপাদান আছে যেগুলি কেবল ব্যবস্থাপনাই নিহিত রয়েছে যেমন ব্যবস্থাপনা পরিসর, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কৌশল, লাইন ও ষ্টাফ ইত্যাদি।

(খ) অপরাপর ক্ষেত্রসমূহ হতে ব্যবস্থাপনা যে সকল উপাদান ধার করেছে তন্মধ্যে পদ্ধতি তত্ত্ব, প্রেষণা, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলগত আচরণ, যোগাযোগ ও গাণিতিক বিশ্লেষণ অন্যতম।

(গ) ব্যবস্থাপকের কার্যাবলীর ভিত্তিতেই ব্যবস্থাপনার স্বরূপ অনুধাবন করতে হবে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্য কতিপয় মৌলিক নীতিমালার সমন্বয়ে সৃষ্ট সুসংবদ্ধ জ্ঞান। সুতরাং একই সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের ও ছোট বড় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের মৌলিক কার্যাবলী একইরূপ হবে।

(ঙ) অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিংবা একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যবস্থাপকদের কার্যের পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী বিভিন্নরূপ হতে পারে।

সমালোচনা

(ক) ব্যবস্থাপক ঠিক কোন কোন কার্য সম্পাদন করবেন তা পূর্বাহ্নে সঠিকভাবে অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ব্যবস্থাপক অনেক সময় অপ্রত্যাশিত কাজও করে থাকেন। সুতরাং এই মতবাদ শুধু ব্যস্থাপনার মৌলিক ধারণার পূর্বাভাষ দিয়ে থাকে।

(খ) এ স্কুলের প্রবক্তাগণ কর্তৃক অঙ্কিত ব্যবস্থাপনার পরিধি অনেকটা অস্পষ্ট।

(গ) অন্যান্য স্কুলের কতিপয় মৌলিক উপাদান ধার করে এ মতবাদকে অন্যান্য মতবাদের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সকলের মানষিক বিপ্লব ব্যতীত ব্যবস্থাপনার অধিকাশ নীতিমালাই তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

কিছু কিছু সমালোচনার সুযোগ থাকলেও এ স্কুলের কিছু প্রশংসনীয় দিকও রয়েছে। অন্যান্য মতবাদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধার করে এ মতবাদ বিশেষ কার্যকারিতা লাভ করেছে। অধিকন্তু এ স্কুলের প্রবক্তরা ব্যবস্থাপনার একটি নির্দিষ্ট সীমানা অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। সর্বোপরি ব্যবস্থাপনার স্বরূপ অনুধাবনে এ মতবাদের ন্যায় অন্যান্য মতবাদগুলি তত কার্যকর নহে।

(৩) মানবীয় আচরণভিত্তিক স্কুল (Behaviour Sciences School)

এ স্কুলেকে Behaviour Sciences School ও বলা হয়। এ মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে- ''যেহেতু ব্যবস্থাপনা হল অপরাপর লোকের মাধ্যমে ও লোকের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া, তাই ব্যবস্থাপনার পর্যালোচনাও সংগঠনের মানবীয় সম্পর্কের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্চনীয়।'' এ স্কুলের উদ্যোক্তাদের মতানূসারে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগণের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যায়ন ও বিশ্লেষন। এ দর্শন মনে করে যে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের কার্য সন্তুষ্টি, কার্যের প্রতি আগ্রহ ও তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল। অধ্যাপক এলটনমেও ও তার কয়েকজন সহযোগী সমাজ বিজ্ঞানী এ স্কুলের প্রবক্তা। নিমোক্ত ধারনাবলীর উপর এ স্কুল প্রতিষ্ঠিতঃ

(ক) এ মতবাদ ব্যবস্থাপনার মানবিক দিকটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে । এ মতবাদের বিশেষ ধারণা যে, ''যেহেতু যে কোন সংগঠনে কর্মরত মানুষ দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে একযোগে কাজ করে তাই তাদের পরস্পরকে উপলব্ধি করতে হবে।

(খ) যেহেতু ব্যবস্থাপনা হল লোকের মাধ্যমে ও লোকের দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া সেহেতু ব্যবস্থাপককে অবশ্যই তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দলগত আচরণ ও সম্পর্ক অনুধাবন করতে হবে।

(গ) সংগঠনে কার্যরত কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্যমান আদর্শ ও মানবিক সম্পর্কের উপরই উৎপাদনের পরিমান ও এর উৎকর্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(ঘ) ব্যবসায়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত জনশক্তি সুসংবদ্ধ সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ।

(ঙ) মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, যথা প্রণোদনা, নেতৃত্ব, যোগাযোগ, দলীয় গতিশীলতা ও মূল্যবোধ, অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ব্যবস্থাপনারই আওতাভুক্ত।

সমালোচনা

(ক) মানবীয় সম্পর্ক হচ্ছে ব্যবস্থাপনার একটিমাত্র উপাদান বা দিক। এ মতবাদ মানবিক দিকের উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য দিক বা উপাদানসমূহকে উপেক্ষা করেছে। অতএব এ স্কুল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রকে শুধুমাত্র মানবীয় আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

(খ) মানবীয় সম্পর্কের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করলে মাঝে মধ্যে (বিশেষ করে অনুন্নত দেশে) কর্মচারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা পরিলক্ষিত হয় যা উৎপাদন কার্যকে দারুনভাবে ব্যাহত করে।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্বেও এ স্কুলই প্রথমবারের মত ব্যবস্থাপনার সামাজিক উপাদানসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংগঠনের যাবতীয় উপকরনণাদি যেমন কাঁচামাল, টাকা-পয়সা, যন্ত্রপাতি, জনশক্তি ইত্যাদির মধ্যে মানুষই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সংগঠনের মানবীয় সম্পর্ককে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

(৪) যোগাযোগ কেন্দ্রীয় স্কুল (Communication Centered School)

এ মতবাদ ব্যবস্থাপককে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ এতে ব্যবস্থাপনা বলতে যোগাযোগ ও এর কার্যাবলীকেই বুঝানো হয়েছে। এ স্কুলের প্রবক্তাদের মতে সংগঠনে ব্যবস্থাপকের কার্য হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ এবং তা সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণ করতঃ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পরিবেশন করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা হচ্ছে Telephone Switch Board এর অনুরূপ। নিম্নোক্ত অনুমিত ধারনাসমূহের উপর এ স্কুল প্রতিষ্ঠিতঃ

(ক) ব্যবস্থাপক হচ্ছেন যোগাযোগের কেন্দ্র।
(খ) তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশনই হচ্ছে ব্যবস্থাপকের কার্য।
(গ) ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগ করা এ মতবাদের একটি বিশেষত্ব।

সমালোচনা

(ক) যোগাযোগ হচ্ছে ব্যবস্থাপনার অনেকগুলি কার্যের মধ্যে একটি মাত্র কার্য। এ মতবাদ ব্যবস্থাপনাকে কেবল যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যবস্থাপনার আওতাকে সংকীর্ণ করেছে।
(খ) এ স্কুলকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং এর ব্যবহারও সীমাবদ্ধ।
(গ) এই স্কুলের বিবরণ হতে ব্যবস্থাপনার বহুমুখী কার্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।
বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও এ স্কুলের কতিপয় আর্কষনীয় দিকও আছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ব্যবস্থাপক তার শতকরা ৮৫ ভাগ সময় যোগাযোগেই ব্যয় করেন। অধিকন্তু এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা হচ্ছে 'কম্পিউটার বিজ্ঞান' প্রয়োগ করার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। এ মতবাদকে বৃহত্তম অর্থে ব্যবহার করলে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

(৫) সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্কুল (Decision Theory School)

এ স্কুলের প্রবক্তাদের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণই ব্যবস্থাপনার মূল কাজ অর্থাৎ তাদের মতে ব্যবস্থাপনা হলো পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে অনুসরণযোগ্য বিভিন্ন বিকল্প পন্থা হতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটি বেছে নেওয়া। এ মতবাদ ভোক্তার পছন্দ, উপযোগ সর্বাধিকীকরণ, নিরপেক্ষ রেখা, প্রান্তিক উপযোগ এবং ঝুকি ও অনিশ্চিয়তার মধ্যে অর্থনেতিক আচরণ' ইত্যাদি

অর্থনৈতিক ধারনাবলী হতে উদ্ভুত হয়েছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর নির্ভরশীল। তাই এই স্কুলের প্রবক্তাগণের মধ্যে অধিকাংশই অর্থনীতিবিদ এবং যারা এ মতবাদের অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক মার্শাল, জোনস ও এইচ.এ, সিমন অন্যতম। নিম্নোক্ত অনুমিত ধারনাবলীর উপর ভিত্তি করে এ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণই ব্যবস্থাপনা।

(খ) সিদ্ধান্তের পরিধি নিয়েই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত।

(গ) অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপরই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক মডেল বিশেষ কার্যকর।

সমালোচনা

(ক) এ স্কুল ব্যবস্থাপনাকে শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। গৃহীত সিদ্ধান্তকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে এ মতবাদে তার কোন উল্লেখ নাই।

(খ) সংখ্যাগত ও গুনগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যাগত দিককে প্রাধান্য দিয়ে এ স্কুল গুনগত দিককে অবহেলা করেছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তবিকই ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়। ব্যবস্থাপপনার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় না। প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধান্ত তত্ত্ব ছিক সিদ্ধান্ত গ্রহনকেই বুঝায় না। বরং ইহা সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে সমগ্র প্রতিষ্ঠানেরই ধারনা প্রদান করে।

(৬) সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রথা স্কুল (Cooperative Social System School)

মানবীয় আচরণ ভিত্তিক স্কুলের সাথে এ স্কুলের যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী সংগঠন হচ্ছে কর্মরত লোকদের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি সমাজ ব্যবস্থা এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন দলকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করে সংগঠনের মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা। এ স্কুলের মূল ভিত্তি হচ্ছেঃ

(ক) সংগঠন একটি সমাজ ব্যবস্থা।

(খ) সংগঠনে কার্যরত বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা ব্যবস্থাপকের মূখ্য দায়িত্ব।

(গ) ব্যবস্থাপকের ভূমিকা এমন হবে যাতে সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী ও কর্মচারীদের দলীয় উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে কোন দ্বন্দ বা সংঘাত না থাকে। অর্থাৎ উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যাবলী হবে পরস্পর পরিপূরক।

সমালোচনা

(ক) যদিও সকল ব্যবস্থাপক সমাজ ব্যবস্থায় কাজ করে তথাপি সকল প্রকার সহযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাবস্থাপক থাকেন না। উদাহরন স্বরূপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ডাকাত দলের সদস্যরা নেতার অধীনে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। কিন্তু এরূপ নেতাগণকে ব্যবস্থাপক বলা যায় না।

(খ) এ স্কুল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছে। অপর পক্ষে ইহা ব্যবস্থাপনার অনেক মৌলিক ধারনা, নীতি ও কৌশলকে উপেক্ষা করেছে।

বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বে এ স্কুলের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মরত কর্মচারীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন দলীয় উদ্দেশ্যর মধ্যে সংঘাত থাকলে অর্থাৎ তারা পরস্পর বিরোধী হলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে। অত্র স্কুল ব্যবস্থাপনার এ মৌলিক বিষয়টির উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে।

(৭) গাণিতিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান স্কুল (Management or Mathmatics Science School)

এ স্কুলের তত্ত্ববিদগণ ব্যবস্থাপনাকে গাণিতিক মডেল ও প্রক্রিয়ার একটি পদ্ধতি বলে মনে করেন। এ স্কুলের প্রবক্তাগণ নিজেদেরকে ''ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানী'' বলে দাবী করেন। তাদের অধিকাংশই ছিল ''Operations Researchers' বা 'Operations Analysis'। তাদের মতে, ব্যবস্থাপনা বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন যদি একটি যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া হয় তাহলে একে কতিপয় গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক প্রতীক বা মডেল প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় উপদানসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতঃ বিভিন্ন গাণিতিক মডেল, ফর্মূলা ও কৌশলের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যাবে। এ সমস্ত গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশলের মধ্যে প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যাবে। এ সমস্ত গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশলের মধ্যে Inventory Management, Linear Programming, Decision Tree, PERT (Programme Evaluation and Review Technique), CPM (Critical Path Method), Simulation, Game Theory, Regression Model, Waiting Line Theory, Queing Theory ও বিভিন্ন প্রকার মডেল উল্লেখযোগ্য। এ স্কুলের অনুমিত ধারণাবলী নিম্নরূপ।

(ক) ব্যবস্থাপনা হচ্ছে গাণিতিক মডেল ও প্রক্রিয়ার একটি পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় উপাদানসমূহকে গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক বিভিন্ন মডেল বা ফর্মূলায় প্রকাশ করতে হবে।

(খ) এ মতবাদের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বিভিন্ন মডেল। কারণ মডেলের মাধ্যমে যে কোন সমস্যাকে মৌলিক সম্পর্ক ও পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা যায়।

(গ) এ স্কুলের সাথে সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্কুলের সাদৃশ্য রয়েছে এবং এর প্রাথমিক কাজ হল বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত মডেল আবিষ্কার করা।

(ঘ) এ মতবাদের প্রবক্তারা 'ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানী' বলে খ্যাত।

সমালোচনা

(ক) যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সংখ্যাগত ও গুনগত বিশ্লেষণ উভয়ই প্রয়োজন। শুধু সংখ্যাগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। গাণিতিক প্রতীক বিজ্ঞানসম্মত হলেও ইহা চূড়ান্ত রায় দিতে অপরাগ।

(খ) ব্যবস্থাপনার এমন কতকগুলি দিক আছে যেখানে গাণিতিক প্রতীক ও ফর্মূলার কোন স্থান নেই যেমন মানবিক সম্পর্ক, নেতৃত্ব, নির্দেশনা ইত্যাদি।

(গ) কার্যতঃ দেখা যায় যে তথাকথিত ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানীরা কদাচিৎ তাদের ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল মাত্র।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্বেও আধুনিক কালে এ স্কুলের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও অংক শাস্ত্রের প্রচুর অবদান রয়েছে। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক প্রতীক, মডেল ও ফর্মূলাসমূহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন- মূলধন বাজেটিং, প্রকল্প পরিকল্পন, মান নিয়ন্ত্রন, সিদ্ধান্ত প্রনয়ন, উৎপাদন পরিকল্পন, যন্ত্রপাতি বিন্যাস ইত্যাদিতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মোটামুটিভাবে ব্যবস্থাপনার জটিল বিষয়াদির ক্ষেত্রে গাণিতিক স্কুলের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। অনেক গণিত শাস্ত্রবিদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক কৌশলাদি প্রয়োগ করেন। উপরন্তু এ সকল মনীষী ব্যবস্থাপনাকে একটি যুক্তিযুক্ত সিস্টেম হিসেবে চালানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

(৮) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্কুল (Management System School)

সম্প্রতি ব্যবস্থাপনাও একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বা সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ মতবাদের উন্নয়নে যারা অবদান রাখেন তাদের মধ্যে চেষ্টার আইবার্নারড, জনসন, চার্চম্যান ও কেনিথ- এর নাম উল্লেখযোগ্য। পদ্ধতি বলতে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক সুসজ্জিত আত্মনির্ভরশীল বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত উপাদান ও বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনাকেই বুঝায়। এ স্কুলেও প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি জটিল পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। প্রত্যেক পদ্ধতির আবার কতগুলি উপ-পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- একটি কারবারী সংগঠন ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, হিসাব বিভাগ, শ্রমিক বিভাগ, কর্মী বিভাগ ইত্যাদি বিভাগসমূহ পরস্পর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগগুলি একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। আবার এ বিভাগগুলিকে কতকগুলি উপ-বিভাগ নিয়ে গঠিত একটি পূর্নাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে মনে করা যায়।

আবার যে কোন সংগঠনকে কতকগুলি উপাদানের সমাহার যেমন- জনশক্তি, কাচাঁমাল, যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি মনে করা হয়। এ সমস্ত অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহও পরস্পর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, জনশক্তি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ না করে তা হলে যন্ত্রপাতি আপনা আপনি কাজ চালাতে পারে না। অন্যদিকে, কাঁচামালের দুস্প্রাপ্যতা বা নিম্নমানের কাচাঁমালও উৎপাদন কার্যকে ব্যহত করে। আবার সরকারী নীতি, প্রতিযোগীতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রযুক্তিবিদ্যা, বাজার ইত্যাদি বাহ্যিক অসংখ্য আন্তঃনির্ভরশীল বিষয়াদি নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ জটিল পদ্ধতি। সহজ কথায় পদ্ধতি হচ্ছে অবিকল মনুষ্য অঙ্গের মত। মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একটি অপরটি ব্যতীত অচল ও অসার, পদ্ধতির প্রকৃতিও তদ্রুপ। নিম্নোক্ত অনুমিত ধারনাবলীর উপর এ স্কুল প্রতিষ্ঠিতঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কয়েকটি বিভাগ ও উপ-বিভাগ নিয়ে সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি।

(খ) সংগঠনের মূল লক্ষ্যের প্রতি নজর রেখে এ সমস্ত বিভাগ ও উপ-বিভাগীগুলি সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত হয়ে কাজ করে।

(গ) পূর্ব র্নিারিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদানসমূহকে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল করতে হয়।

সমালোচনা

(ক) ক্ষুদ্রায়তন সংগঠনে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ জটিলতা আনয়ন করে।

(খ) কোন পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। এ বিশাল পৃথিবীও একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি নহে।

(গ) এ স্কুল ব্যবস্থাপনার পরিধিকে অহেতুক বিস্তৃত করেছে।

কিছু কিছু সমালোচনার অবকাশ থাকলেও এই স্কুলের কতিপয় আকর্ষনীয় দিকও রয়েছে। ইহা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় উপাদানের উপর সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। দক্ষ ব্যবস্থাপক দ্বারা যথাযথভাবে এ মতবাদ প্রয়োগ করলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আশাতীত ফল লাভ করতে পারে।

(৯) পরিস্তিতি প্রেক্ষিত স্কুল (Contingencey or Situation School)

এ মতবাদটি ১৯৭০ সালের দিকে পরিচিতি লাভ করে। জন ওডওয়ার্ড, পলরেন্স, জি, এম, স্টেকার, জেমস ডি থম্পসন প্রমুখ এ স্কুলের প্রবক্তা। এই সকল পন্ডিতগণ ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিমালার বৈধতা ও কার্যকারীতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন। পরিস্থিতিবিদগণ মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট কোন একক সর্বোত্তম পদ্ধতি নেই। কারন বিভিন্ন সংগঠনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বহুমুখী কার্য সম্পাদন করতে হয়। স্বভাবতই একটি কর্পোরেশন, একটি ক্লাব ও একটি পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

কোন অবস্থাতেই একইরূপ হবে না। যখন যে ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করে তখন ঠিক তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনাও পরিবর্তিত হবে। অতএব, এ স্কুলের মূল বক্তব্য হলো- ''সম্ভাব্য পরিস্থিতির উপরই ব্যবস্থাপনার ধরন র্নিভর করে।'' সুতরাং নিম্নোক্ত অনুমিত ধারনাবলীর উপর এ স্কুল প্রতিষ্ঠিতঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা কিরূপ তা নির্ভর করে সম্ভাব্য পরিস্থিতির উপর।

(খ) ব্যবস্থাপনার কার্যবলী যেমন- পরিকল্পন, সংগঠন, নেতৃত্ব, প্রণোদনা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট সর্বোত্তম কোন পন্থা নেই।

(গ) ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সর্বরোগের মহৌষধ নহে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান শুধু কার্য সম্পাদনের একটি উত্তম পন্থা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে মাত্র। ইহা সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে থাকে।

(ঙ) সংগঠনকে অভ্যন্তরীন কার্য প্রক্রিয়া, তার বাহ্যিক পরিবেশ, প্রযুক্তিবিদ্যা, ইত্যাদি বিবেচনা করতঃ এর অন্তর্গত সকল পক্ষের দাবী দাওয়া মিটাতে সক্ষম হতে হবে।

(চ) ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের তত্ত্বগত আঙ্গিক শুধুমাত্র একটি সর্বোত্তম অনুমিত পন্থার মতবাদ হিসেবে উন্নতি লাভ করেছে।

সমালোচনা

(ক) ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিমালা ও তত্ত্বকে শুধুমাত্র অবজ্ঞা করে। এ মতবাদ ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিয়েছে।

(খ) যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও মৌলিক নীতিমালার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া পাওয়া যাবে না যা নিত্য নতুন গবেষনা কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে।

(গ) ব্যবস্থাপকের যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

এ স্কুলের বিশেষত্ব এই যে, ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য কোন ব্যবস্থা নেই। কোন চিকিৎসক প্রত্যেক রোগীকে পেনিসীলিন ইনজেকশন প্রদান করেন না। এক বিশেষ অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সুফল প্রদান করেছে পরিবর্তিত অবস্থায় তা কুফলও দিতে পারে। পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে এ মতবাদ ব্যবস্থাপনার গুনগত দিকের উন্নয়ন সাধন করেছে।

(১০) ব্যবস্থাপনা ভূমিকা এ্যাপ্রোচ/স্কুল (The Management Roles Approach/School)

সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুলসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরী মিনসবার্গ এ স্কুলের প্রবক্তা। তার মতে ব্যবস্থাপকগণ বাস্তবে যে সকল কার্য সম্পাদন করেন তা অবলোকনের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে উপসংহারে পৌছতে হবে। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপকদের প্রকৃত কার্যাবলীই ব্যবস্থাপনার ভূমিকা নির্ধারণ করে থাকে। অধ্যাপক মিনসবার্গ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ৫ জন প্রধান নির্বাহীর কার্যাবলী যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন যে, তারা গতনানুগতিক ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী যথা পরিকল্পন, সংগঠন, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির পরিবর্তে বরং অন্যান্য বহুবিধ কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকেন।

ব্যবস্থাপনা ভূমিকা এ্যাপ্রোচ বা স্কুল সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতবাদ সমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি কানাডায় অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি মিনসবার্গ এ এ্যাপ্রোচের উদ্ভাবক। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগন

যে সকল কার্য সম্পাদন করেন তা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকগন কর্তৃক সম্পাদিত সাধারন কার্যক্রমই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেবে।

অধ্যাপক মিনসবাস বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫(পাঁচ) জন প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেন যে, তাদের গতানুগতিক ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী যেমন- পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমে বেশী নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে নিচে উল্লেখিত কার্যক্রমই প্রধান। মিনসবার্গ তার নিজের ও অন্যান্যদের একইরূপ গবেষনা লব্ধ তথ্য হতে এ উপসংহারে উপনীত হলেন যে, ব্যবস্থাপকবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে মোট ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন। এ সকল কার্যাবলীকে নিম্নে ৩টি শ্রেনীতে বিভক্ত করে দেখানো হলঃ

(ক) আন্তঃব্যাক্তিক ভূমিকা (Inter-Personal Roles) ঃ

১। নামমাত্র প্রধানের ভূমিকা (The figure head role)

২। নেতার ভূমিকা (The Leader role)

৩। জনসংযোগের ভূমিকা (The Liaison role)

(খ) তথ্যসংক্রান্ত ভূমিকা (Informational role) ঃ

১। প্রাপকের ভূমিকা (The recipient role)

২। প্রচারকের ভূমিকা (The disseminator's role)

৩। মুখপাত্রের ভূমিকা (The Spokesperson role)

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা (Decision Roles) ঃ

১। উদ্যোক্তার ভূমিকা (Entrepreneurial role)

২। সমস্যা মোকাবিলা কারীর ভূমিকা (The disturbance handler role)

৩। সম্পদ বন্টনকারীর ভূমিকা (The resource allocator role)

৪। মধ্যস্থকারীর ভূমিকা (The negotiator role)

সমালোচনা ঃ

মিনসবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদের কিছু সমালোচনাও রয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ–

১। এটি অল্পকয়জন প্রধান নির্বাহীর উপর গবেষণা চালিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২। ব্যবস্থাপকগন এমন অনেক কাজ করেন যা ব্যবস্থাপকীয় নয়। যেমন- অর্থসংগ্রহ, গণসংযোগ, প্রচারনা প্রভৃতি।

৩। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকদের যে সকল কার্যাবলির কথা বলেছেন, সেগুলি ব্যবস্থাপনার সাধারণ কার্যাবলির বাইরে নয়।

৪। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। যেমন- সেখানে ব্যবস্থাপনার কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপকদের নির্বাচন, কার্যসম্পাদনের স্ট্রাটেজি নির্ধারন প্রভৃতি স্থান পায়নি।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, মিনসবার্গের মতবাদ ব্যবস্থাপকদের প্রকৃত কার্য সম্পাদনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অধিকন্তু এরূপ মানোন্নয়নে ব্যবস্থাপকদের ভূমিকাই মূখ্য। পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও মিনসবার্গের উদ্ভাবিত এ্যাপ্রোচের সমালোচনা করা হয়েছে, তথাপি এটি ব্যবস্থাপকদের কার্যসম্পাদন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বলেছে।

(১১) ম্যাককিনসের সপ্ত–এস এ্যপ্রোচ (The Mckinsey's Seven-S Approach)

ম্যাককিনস এ্যান্ড কোম্পানি"– একটি ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শদানকারী সংস্থা। এ সংস্থা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে সাতটি- এস (Seven-s) উদ্ভাবন করে, যা পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ এ্যপ্রোচের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে æThe Art of Japanese Management" ও æIn search of Excellence" -এর উপর গবেষনা কার্য পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এ দুটি গবেষনা বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটি জনপ্রিয়তা অর্জনের আরেকটি কারণ হলো- তৎকালীন হার্ভার্ড ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত 'বিজনেস স্কুল' (Business School) বিভিন্ন গবেষনায় সপ্ত-এস (Seven-S) এ্যপ্রোচটি ব্যবহার করেছে।

ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শদানকারী সংস্থা হিসেবে বিখ্যাত ম্যাককিনসে এন্ড কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের ''সপ্ত-এস'' অধুনা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই দু'খানা best selling ব্যবস্থাপকীয় বই æThe Art of Japanese Management'' এবং "In Search of Excellence" এর গবেষনা কার্য পরিচালিত হয়েছিল।

ম্যাককিনসের সপ্ত- এস হচ্ছে- Stratagy, Structure, System, Style, Staff, Shared values and Skills'' বস্তুতঃ æS" দিয়ে উদ্ভাবিত সবগুলো ব্যবস্থাপকীয় কাজ ব্যবস্থাপনার সর্বজন স্বীকৃত কার্যাবলী- পরিকল্পন, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ- এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ম্যককিনসের কোম্পানী ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শদানে তাদের এ ''সপ্ত-এস''-কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। একই সময় হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড এর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায় স্কুল এন্ড ''সপ্ত-তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ভিত্তি বেশ দৃঢ়। ম্যাককিনসের সপ্ত-এস নিম্নরূপ:

১। স্ট্রাটেজি (Strategy) ঃ এর অর্থ হলো- কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের যথাযথ বন্টন ও পদ্ধতিগত কার্যক্রম।

২। কাঠামো (Structure)ঃ কাঠামো বলতে সংগঠন কাঠামো ও কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝায়।

৩। পদ্ধতিসমূহ (Systems)ঃ কার্য সম্পাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝায়, যার মধ্যে রয়েছে- তথ্য ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজেটিং ও নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া।

৪। স্টাইল (Style)ঃ স্টাইল হলো এমন পন্থা যাতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কি ধরনের আচরণ করবে এবং সম্মিলিত ভাবে তারা কিভাবে সময় ব্যয় করবে।

৫। স্টাফ (Staff)ঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীগণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে তাদেরকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া।

৬। পারস্পরিক মূল্যবোধ (Shared value)ঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মীগণের মধ্যে মূল্যবোধ বিনিময় করবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে।

৭। দক্ষতাসমূহ (Skills)ঃ দক্ষতা বলতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মক্ষমতা বা যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এটি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে আলাদা করার যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।

''সপ্ত-এস'' এর প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্কেও উপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা ব্যবস্থাপনার সামগ্রীক কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে একটি নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। অধিকন্তু ''সপ্ত-এস'' তত্ত্বে শ্রমিক-কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও লক্ষ্যের তুলনায় সমগ্র প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও লক্ষ্যে উপরই জোর দেয়া হয়েছে বেশী। এতে প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে। সমালোচকদের মতে ''সপ্ত-এস''কে বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ''সপ্ত-এস'' এর টার্মসমূহ অনেকটা অস্পষ্ট। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সপ্ত-এস তত্ত্ব খুবই সহজবোধ্য এবং মনে রাখাও কষ্টকর নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত সপ্ত-এস পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ অর্থাৎ আন্তঃসম্পর্কীত, ফলে এটি ব্যবস্থাপনার কার্যকারীতা যথাস্থনে বৃদ্ধি করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর

জোর দেয়া হয়েছে। সপ্ত-এস কার্যকারীতায় শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরী।

(১২) উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ধারক এ্যাপ্রোচ (The Attributes of Excellence)

দু'জন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা পরামর্শক (Consultant) টমাস জে. পিটার্স ও রবাট এইচ, ওয়াটারম্যান জুনিয়র গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের এমন কিছু "গুণাবলি" (attributes) উদ্ভাবন করেছেন যা ব্যবস্থাপকদের কার্যে উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। এ সকল গুণাবলি বা নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপকগণ তাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ জন্য এ গুলিকে একত্রে" উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ণায়ক এ্যাপ্রোচ" বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৮২ সালে টমাস জে.পিটার্স ও রবার্ট এইচ.ওয়াটারম্যান জুনিয়র "In Search of Excellence" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবংএ পুস্তকে উৎকর্ষতার নির্ণায়ক বা গুণাবলি এ্যাপ্রোচটি বিধৃত করেন। তারা তাতে বলার প্রয়াস পান যে, আমেরিকার নামি-দামি কোম্পানিগুলি কিভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ এ এ্যাপ্রোচটিকে কয়েকটি কারণে গতানুগতিক বা সাধারণ ধারা থেকে আলাদা বলে অভিহিত করেন। কারণগুলি হলো-

১। তারা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনাকে রক্ষণশীল, আবেগহীন, অনমনীয়, নেতিবাচক ও বাগাড়ম্বর বলে অভিহিত করেন।

২। তাঁরা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি যেমন- পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রন ইত্যাদির পরিবর্তে নূতন পরিভাষা যেমন– ঘুরে বেড়ানো ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Management by wandering Around) ব্যবহার করেন।

৩। তাঁরা গবেষণার মূল বিষয়কে সংখ্যাত্মক তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেননি। তদপরিবর্তে গল্প বা কাহিনীর মাধ্যমে তা উপস্থাপনের প্রয়াস পান।

উৎকর্ষতার আটটি নির্ণায়ক

Eight Attributes of Excellence

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোত্তম ব্যবস্থাসম্পন্ন ৩৬ টি কোম্পানির উপর নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেখানে পিটার্স ও ওয়াটারম্যান উৎকর্ষতার ৮ টি নির্নায়ক আবিষ্কার করেন। এগুলি নিম্নরূপ-

১। কাজের প্রতি আগ্রহ (Interest among work)
২। ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা (Close to the customer)
৩। নিজ প্রশাসন ও উদ্যেগ (Autonomy & Entrepreneurship)
৪। শ্রমিক- কর্মীদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা (Productivity through people)
৫। সতর্কতা ও মূল্যবোধ তাড়িত (Hands on and value driven)
৬। দৃঢ়তার সাথে যুক্ত থাকা (Stick to the knitting)
৭। সহজ ধরণ, স্বল্প অফিসকর্মী (Simple form, Loan staff)
৮। একই সাথে ঢিলা- শক্ত গুণ (Simultaneousy Lose-tight properties)

উৎস ঃ পিটার্স টমাস জে,ও ওয়াটারম্যান জুনিয়র রবার্ট এইচ," ইন সার্স অব এক্সিলেন্স"হার্পার কলিন্স পাবলিশার্স ইনক, 1982

শিক্ষার্থীর কাজ	হেনরি ফেয়ল ও এফ ডব্লিও টেলরের কাজের তুলনা করুন।

সারসংক্ষেপঃ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাও একটি অত্যাবশ্যকীয় কৌশল ও জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিংশ শতাব্দীর এ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক শিল্প জগতে ব্যবস্থাপনা তার স্বীয় প্রোজ্বলতায় দেদীপ্যমান। ব্যবস্থাপনার এহেন উন্নয়নে অনেক খ্যাতিমান গবেষক ও চিন্তাবিদ বহু মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এ সকল মনীষীদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পপতি, পেশাদার ব্যবস্থাপক, বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, স্বনামধন্য অধ্যাপক, শিল্প মনোবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ রয়েছেন। এ সকল মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যবস্থাপনা কি, একে কিভাবে আয়ত্ব করতে হবে ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়েই এ সকল মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করেন। পরবর্তীকালে এ সমস্ত ধ্যান ধারনাই ব্যবস্থাপনা মতবাদের স্কুল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যবস্থাপনা মতবাদের এ স্কুলগুলি ব্যবস্থাপনা দর্শনের এত অধিক সংখ্যক স্রোতধারার উদ্ভব ঘটিয়েছে যে সাম্প্রতিক কালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদেরকে এবং পেশাদার ব্যবস্থাপকগণ তাদের অধিনস্থ কর্মীদেরকেক কোন পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে দ্বন্দ্বে পড়েছেন। ব্যবস্থাপনা মতবাদের প্রধান স্কুলসমূহের উল্লেখ করা হলোঃ অভিজ্ঞতা প্রসূত স্কুল বা কেইস স্কুল, কার্যভিত্তিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্কুল, মানবীয় আচরণ ভিত্তিক স্কুল, যোগাযোগ কেন্দ্রিয় স্কুল, সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্কুল, সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রথা স্কুল, গাণিতিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান স্কুল, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্কুল, পরিস্থিতি প্রেক্ষিত স্কুল, ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা স্কুল, ম্যাককিনসের "সপ্ত-এস" স্কুল।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. মধ্যযুগের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা (১৭৫০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা (১৮৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পযন্ত) সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. অভিজ্ঞতা প্রসূত স্কুল বা কেইস স্কুল বর্ণনা করুন।
৬. কার্যভিত্তিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্কুল বর্ণনা করুন।
৭. মানবীয় আচরণভিত্তিক স্কুল আলোচনা করুন।
৮. যোগাযোগ কেন্দ্রীয় স্কুল বর্ণনা করুন।
৯. সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্কুল সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
১০. সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রথা স্কুল বর্ণনা করুন।
১১. গাণিতিক স্কুল বা ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান স্কুল বর্ণনা করুন।
১২. ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্কুল বর্ণনা করুন।
১৩. পরিস্তিতি প্রেক্ষিত স্কুল বর্ণনা করুন।
১৪. ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা স্কুল বর্ণনা করুন।
১৫. ম্যাককিনসের সপ্ত-এস স্কুল বর্ণনা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Ricky W. Griffin, Management,12th Edition, AITBS Publication, New Delhi.
- Introduction to Management, Dr.M A Mannan & Dr. Md. Ataur Rahman
- Fundamental of Management (10th Edition), Stephen P Robbins, Mary Coulter, David A DeCenzo, Harlow Publisher, England Pearson (2017).